তৃতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগ (বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)

Colonial Era
(First half of the 20th Century)

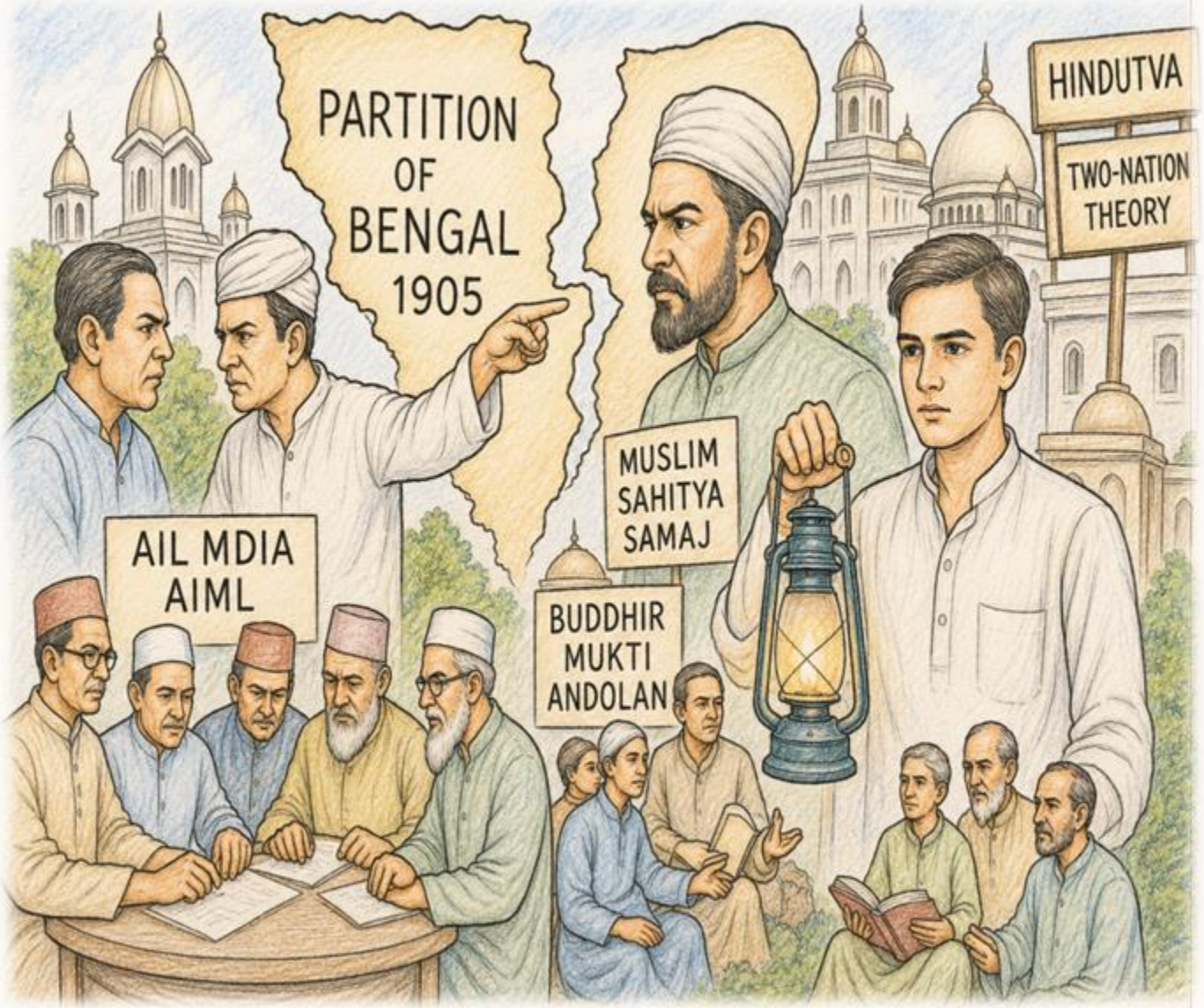

পটভূমি ও প্রারম্ভিক ইতিহাস

পূর্ববাংলার বঞ্চনার ইতিবাচক সমাধান

বিশ শতকের শুরুতে কলকাতার সামন্ত ও ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া আধিপত্যের কবলে পড়ে পূর্ববাংলার মুসলিম ও কৃষক সমাজ মারাত্মকভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হচ্ছিল।

পূর্ববাংলার অবহেলিত মানুষকে মুক্তি দিতে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ পূর্ববাংলার গণমানুষের দাবি সম্বলিত প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করেন। লর্ড কার্জন প্রশাসনিক যৌক্তিকতা বিচার করে শেষ পর্যন্ত বাংলাকে বিভক্ত করার ঐতিহাসিক উদ্যোগ নেন।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণ

১. প্রশাসনিক যৌক্তিকতা

বিশাল ভূখণ্ড: অবিভক্ত বাংলার আয়তন ছিল প্রায় ২ লাখ বর্গমাইল। একজন মাত্র গভর্নরের পক্ষে এই সুবিশাল প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা এবং শাসনকার্য পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

আসামের সীমানা ও নিরাপত্তা: আসাম অঞ্চলের ক্ষুদ্রতা কাটানো এবং পূর্ববাংলার চরাঞ্চল ও দুর্গম দ্বীপগুলোতে চুর-ডাকাতি রোধ করে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল।

২. রাজনৈতিক কৌশল ও বিভেদনীতি

জাতীয়তাবাদী চেতনা দমন: ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা কেন্দ্রিক বিপ্লবী আন্দোলন নস্যাৎ করা ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

'Divide and Rule' নীতি: ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলিমদের ঐতিহাসিক সম্প্রীতির ঐক্য ভেঙে একটি সম্প্রদায়কে আনুকূল্য দিয়ে ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৩. অর্থনৈতিক কৌশল ও বৈষম্য

কলকাতার প্রাধান্য হ্রাস: ব্যবসা, বাণিজ্য, অফিস-আদালত সব ক্ষেত্রে কলকাতার একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববাংলার মুসলমানদের ন্যায্য পাওনা ফিরিয়ে দেওয়ার আশা তৈরি হয়।

পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি: পূর্ববাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল পাট উৎপন্ন হলেও সব পাটকল ছিল কলকাতায়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের নিজস্ব শিল্পায়নের সুযোগ তৈরি হয়।

চাকরির ক্ষেত্র তৈরি: ১৮৭১ সালের এক সরকারি হিসেবে মুসলমানদের সরকারি চাকরিতে অবদান ছিল মাত্র ৫.০৯%, যেখানে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল ৪১%। এটি শিক্ষিত মুসলমানদের মনে চরম হতাশা সৃষ্টি করেছিল।

সামাজিক মর্যাদা রক্ষা: ব্রিটিশদের আসার পর মুসলিম জমিদারি ধ্বংস হয়ে যায় এবং হিন্দুরা একচ্ছত্র সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করে। মুসলমানরা নিজেদের হারানো অবস্থান ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে।

ভিন্নমুখী সামাজিক প্রতিক্রিয়া

প্রদেশ (Province)	অন্তর্ভুক্ত এলাকা	রাজধানী	প্রথম গভর্নর	জনসংখ্যা ও প্রধান বৈশিষ্ট্য
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ	পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা	কলকাতা	অ্যান্ড্রু ফ্রেজার	৫ কোটি ৪০ লাখ (হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল)
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ	রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আসাম	ঢাকা	স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার	৩ কোটি ১০ লাখ (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল)

**লর্ড কার্জনের নির্দেশে ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা এবং ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে এটি কার্যকর করা হয়।*

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: আশীর্বাদ

আনন্দ প্রকাশ: পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা এই সিদ্ধান্তকে সাদরে বরণ করে। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ এটিকে স্বাগত জানায়।

ঢাকার পুনর্জাগরণ: ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় আবার হারানো গৌরব ফিরে পায়। নির্মিত হতে থাকে সুরম্য হাইকোর্ট, সচিবালয় এবং চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়ন দ্রুত ত্বরান্বিত হতে থাকে।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া: তীব্র ক্ষোভ

বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ: কলকাতার হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও সাংবাদিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা এটিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর চরম আঘাত মনে করে।

বয়কট ও চরমপন্থা: স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ঘোষণা আসে। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এর মতো চরমপন্থী সংগঠনের গোপন বিপ্লবী কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গভঙ্গের বহুমুখী ফলাফল

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গ সুরক্ষায় এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উত্থান

বঙ্গভঙ্গ রোধে হিন্দু নেতাদের প্ররোচনায় বৈপ্লবিক চরমপন্থা সৃষ্টি হয়। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা হামলা ও পরবর্তী ফাঁসির মধ্য দিয়ে সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

ঢাকার মর্যাদা বৃদ্ধি

ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় হাইকোর্ট ভবন, সচিবালয় ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মিত হয়, যা পূর্ববঙ্গের সামগ্রিক মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

আর্থসামাজিক বিকাশ

পূর্ববঙ্গে নতুন নতুন সড়ক, রেলপথ নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের প্রভূত উন্নয়ন হয়। মুসলমানদের শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ

উগ্র চরমপন্থী সহিংস আন্দোলন এবং কলকাতার ব্যবসায়ীদের তীব্র চাপের মুখে অবশেষে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ রাজ বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

১৯০৫
১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর এবং তীব্র বিক্ষোভের সূচনা।

১৯০৬
অধিকার রক্ষায় ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক দলের জন্ম।

১৯০৮
স্বদেশী আন্দোলন ও চরমপন্থী বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সহিংস তৎপরতা বৃদ্ধি।

১৯১১
ব্যবসায়িক চাপ ও রাজকীয় দরবারে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কারণসমূহ

সাংস্কৃতিক চেতনা

বাংলার স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য রক্ষায় জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রচার। কবি-সাহিত্যিকদের রচনার মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি।

বাংলার নবজাগরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে বাঙালির মধ্যে নবরূপে ঐক্য ও সংহতি জাগ্রত হয়।

জাত্যভিমান ও ঔদ্ধত্য

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর জাত্যভিমান এবং সাধারণ মানুষের ওপর তাদের পাশবিক অত্যাচার শিক্ষিত সমাজে ঘৃণার জন্ম দেয়।

আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিলাতি পণ্য বর্জন

বিলেতি বস্ত্র, লবণ, চিনি ও সিগারেট বর্জন করা ছিল আন্দোলনের ইতিবাচক দিক। মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির বাজারে আঘাত হানা।

ব্রিটিশ সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের নীতিনির্ধারণে বাধ্য করা ছিল একটি প্রধান কৌশল।

দেশীয় পুনরুজ্জীবন

দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি সাধন ও দেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ। চরকার ব্যবহার ও খাদি শিল্পের প্রসার।

স্বদেশি আদর্শের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে পুনর্জীবিত করে গড়ে তোলা এবং দেশাত্মবোধের জাগরণ সৃষ্টি করা।

আন্দোলনের বহুমুখী প্রকৃতি

- **রাজনৈতিক আন্দোলন:** মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করা এবং ব্রিটিশ শিল্পমালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।
- **অর্থনৈতিক আন্দোলন:** ব্রিটিশ বস্ত্র ও লবণের বাজার ধ্বংস করে দেশীয় কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করা।
- **সামাজিক আন্দোলন:** বিভিন্ন জেলায় 'স্বদেশ বান্ধব', 'ব্রতী', সাধনা' ও 'অনুশীলন' এর মতো স্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠন।
- **সাংস্কৃতিক আন্দোলন:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও মুকুন্দ দাসের দেশাত্মবোধক সংগীতের মাধ্যমে জনমত গঠন।

সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রভাব

কবির কণ্ঠে প্রতিবাদ

স্বদেশি আন্দোলনকে বেগবান করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান এবং মুকুন্দ দাসের চারণগীতি বাঙালির মনে অভূতপূর্ব দেশপ্রেমের সঞ্চার করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর 'রাখী বন্ধন' উৎসবের সূচনা করেন, যা ছিল হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতীক।

"বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান..."

ব্রিটিশ দমননীতি ও ছাত্রসমাজ

কার্লাইল সার্কুলার (১০ অক্টোবর ১৯০৫)

ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ রোধ করতে সরকার এই দমনমূলক প্রজ্ঞাপন জারি করে। ছাত্রদের রাজনৈতিক সভা ও পিকেটিং নিষিদ্ধ করা হয়।

দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয় এবং বাংলার ছাত্রসমাজ সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন করে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়।

লর্ড কার্জনের কঠোর প্রশাসক নীতি বিপ্লবীদের দমনে চরমপন্থি আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে।

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণসমূহ

হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য

আন্দোলনে অধিকাংশ মুসলিমের অংশগ্রহণ ছিল না। এটি উচ্চবিত্ত হিন্দু আন্দোলনের রূপ লাভ করায় মুসলমানদের সমর্থন হারায়।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের ভাঙন ও নেতাদের গ্রেপ্তার আন্দোলনকে সাংগঠনিকভাবে পঙ্গু করে দেয়।

কৃষক সম্পৃক্ততার অভাব

আন্দোলনটি মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত ও এলিটিস্টদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, দরিদ্র কৃষক সমাজকে একীভূত করতে ব্যর্থ হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রধান কারণসমূহ

সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও চাপ

যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির মতো গুপ্ত সংগঠনগুলোর চোরাগুপ্তা হামলা ও ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হত্যাচেষ্টা সরকারকে আতঙ্কিত করে।

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর মতো বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

সংবাদপত্র ও ব্যবসায়ী চাপ

কলকাতার জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে তীব্র বিরোধিতা করে। ব্রিটিশ পণ্যে অগ্নিসংযোগ ইংল্যান্ডের শিল্পমালিকদের শঙ্কিত করে।

'ডেইলি নিউজ' ও 'বেঙ্গলি' পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রভাব ও ফলাফল

বিষয়	প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল
মুসলিম প্রতিক্রিয়া	তীব্র হতাশার সৃষ্টি। মুসলমানরা উপলব্ধি করে যে ইংরেজরা কেবল হিন্দুদের স্বার্থের জন্যই বঙ্গভঙ্গ রদ করেছে।
সাম্প্রদায়িকতা	হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের দেয়াল তৈরি হয় এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিকাশ লাভ করে।
জাতীয়তাবাদ	ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, যা পরবর্তীকালে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান-ভারত রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি করে।
রাজধানী স্থানান্তর	আন্দোলনের কেন্দ্র কলকাতা থেকে সরিয়ে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয় (১৯১১)।

হিন্দু-মুসলিম মতবিরোধের স্বরূপ

বৈষম্য ও দ্বন্দ্বের বহুমাত্রিক রূপ

এই মতবিরোধ কেবল ধর্মীয় পার্থক্য নয়; বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত গভীর বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধানত জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসনিক পদে প্রভাব বিস্তার করছিল, যা মুসলমান কৃষক ও নিম্নবিত্তদের জন্য সীমিত ছিল। ফলে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে।

ব্রিটিশদের 'Divide and Rule' নীতি

ব্রিটিশরা এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করে মতবিরোধকে দীর্ঘস্থায়ী রূপদান করে। তারা 'বিভক্ত ও শাসন কর' নীতির আওতায় আলাদা ভোটাধিকার, পৃথক নির্বাচনি আসন এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য চালু করে, যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এটি পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করে।

সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্র: রাজনৈতিক ও সামাজিক

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য

বাংলার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাপতিদের পাশাপাশি হিন্দু সেনাপতিদের অসাধারণ রণনৈপুণ্যই এই গভীর রাজনৈতিক সম্পর্কের উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উদাহরণ।

সামাজিক উৎসব ও আদান-প্রদান

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সুসম্পর্ক বিরাজমান ছিল। কবি বিজয়গুপ্তের মতে, চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে ৯০০ মুসলমান গায়ক (কাওয়াল) যোগদান করেছিলেন। উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা মুসলমানদের জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদি উৎসবে অংশ নিতেন ও উপহার দিতেন। বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবার মুসলমানদের সাথে সামাজিক সংস্পর্শের কারণে কৌলীন্যচ্যুত হয়েছিলেন (যেমন: শেরখানি, পীরাক্ষী ও শমিস্তখানি পরিবার)।

প্রশাসনিক অংশীদারিত্ব ও উচ্চপদ

মুসলিম শাসকরা জ্ঞানী ও দক্ষ হিন্দুদের সরকারি পদ, উপাধি ও জমিদান করেন। যেমনড়চলন বিলের উত্তরাঞ্চলে জয়ানন্দ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ভাদুড়ি 'দেওয়ান' হিসেবে নিযুক্ত হন। আবার কংস নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সুলতান 'উজির' পদে নিযুক্ত করেন। মুসলিম শাসকরা সেনাপতি, উজির, দেওয়ান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ দিয়ে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়েন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় উদারতা

মুসলিম শাসকরা হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণব গুরু শ্রীচৈতন্যের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি বিরূপ হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাহায্য কামনা করলে, সুলতান বাস্তবতার নিরিখে শ্রীচৈতন্যকে নির্বিঘ্নে ধর্মপ্রচার করার রাজকীয় অনুমতি প্রদান করেন। হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

অসম বিকাশের মূল কারণসমূহ (শিক্ষা ও প্রশাসন)

ইংরেজদের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ইংরেজরা মনে করত একমাত্র মুসলমানরাই এদেশের শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারে। তাই তারা শুরু থেকেই হিন্দুদেরকে অনুগত রাখার জন্য কাছে টেনে নেয় এবং মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেয়।

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব

কোম্পানি ইংরেজি শিক্ষা চালু করলে হিন্দুরা তা সানন্দে গ্রহণ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সচেতন হয়। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করায় সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

নব্য হিন্দু জমিদার শ্রেণির উত্থান

কোম্পানি শাসন স্থায়ী করার লক্ষ্যে হিন্দুদের একচেটিয়া পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকে। এর ফলে প্রাচীন মুসলিম জমিদারদের পরিবর্তে এক নতুন অনুগত হিন্দু জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়।

হিন্দু সমাজে সংস্কার

হিন্দু সমাজে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মুক্তচিন্তার সমাজসংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটে, যারা সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন সংস্কারক না থাকায় তারা গোঁড়ামিতে আটকে থাকে।

মুসলমানদের সশস্ত্র বিপ্লব

মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসন সহজে মেনে নেয়নি। তারা হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেতে বারবার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের সবসময় চরম বৈরি ও সন্দেহভাজন দৃষ্টিতে দেখত।

হিন্দুদের রাজনৈতিক সংগঠন

শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তরা অধিকার আদায়ে একের পর এক সংগঠন গড়ে তোলে: বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং কংগ্রেস (১৮৮৫)। মুসলমানদের এমন কোনো সংগঠন ছিল না।

হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের অর্থনৈতিক কারণ

পদের একচেটিয়াকরণ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

পাশ্চাত্য শিক্ষার সুবাদে সরকারের সকল উচ্চপদ একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুদূরপ্রসারী ফলে পুরাতন মুসলিম জমিদাররা তাদের ঐতিহ্যবাহী জমিদারি হারান এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ নতুন হিন্দু জমিদারদের হাতে চলে যায়।

মহাজনী শোষণ ও কৃষক আন্দোলন

গ্রামীণ হিন্দু মহাজনেরা নিরুপায় মুসলমান কৃষকদের চড়া সুদে ঋণ দিয়ে শোষণের জাল বিস্তার করে। সুদের নির্মম জুলুম ও ফসল কেড়ে নেওয়ার কারণে মুসলমান কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্যই মূলত রংপুরের কৃষক আন্দোলন এবং তেভাগা আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক বিদ্রোহগুলোর সূত্রপাত হয়, যা পরবর্তীতে ধর্মীয় সংঘাতের রূপ নেয়।

ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত উদ্ভব

ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ ও বুর্জোয়া রাজনীতি

ঐতিহাসিক সি. জি. শাহ-এর মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার জন্ম না দিলেও 'বিভক্ত করে শাসন করা' নীতির সাহায্যে তাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বিপিন চন্দ্রের মতে, "সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও ব্রিটিশ নীতি ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের নিয়ন্তা।" ১৯ শতকের শেষে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রুখতে ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িকতাকে লেলিয়ে দেয়।

লাহোর প্রস্তাব থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ

১৯৪০ সালের পর থেকে সাম্প্রদায়িকতা তীব্র রূপ নেয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানরা আলাদা রাষ্ট্রের দাবি জানায় এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয় এই দাবিকে বৈধতা দেয়। এর ফলে কলকাতায় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং চরম সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়।

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (এআইএমএল) গঠন

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মতো কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হয় যে তারা মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে আন্তরিক নয়। ফলে মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ (ঢাকা)

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের পর নবাব ভিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে রাজনৈতিক অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে সলিমুল্লাহর দল গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

চিত্র : নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (মূল উদ্যোক্তা)

মুসলিম লীগের প্রথম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আগা খান
প্রথম সভাপতি
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামোর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
সহ-সভাপতি
দলের মূল রূপকার এবং অন্যতম শীর্ষ পৃষ্ঠপোষক।

নবাব মহসিন-উল-মুলক
যুগ্ম-সম্পাদক
আলীগড় আন্দোলনের ধারা এবং দাপ্তরিক কাজের সমন্বয়ক।

নবাব ভিকার-উল-মুলক
যুগ্ম-সম্পাদক
উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি ও অন্যতম প্রধান সংগঠক।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১. সমাজসংস্কার আন্দোলন

১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহের পর মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা যুক্ত হয়। ১৮৬৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ কর্তৃক কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' ও ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমির আলি কর্তৃক 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হলে মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয় ও রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করে।

২. কংগ্রেসের পক্ষপাতমূলক প্রভাব

১৮৮৫ সালে অসাম্প্রদায়িক দাবি নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমান্বয়ে তা হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন শুরু করে। ফলে মুসলমানদের দাবিদাওয়া ও স্বার্থ অবহেলিত হতে থাকে, যা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে চরম হতাশ করে এবং একটি পৃথক প্ল্যাটফর্ম গঠনে বাধ্য করে।

৩. নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ভূমিকা

নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকায় নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত সভায় 'প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে 'সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ' গড়ার পরিকল্পনা নেন, যা মুসলিম লীগের মূল ভিত্তি ছিল।

৪. আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের সরাসরি রাজনীতিতে না এনে শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিল। এই শিক্ষা সম্মেলনের মঞ্চেই শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

৫. ভারতীয় মুসলমানদের চরম দুরবস্থা

সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীব্র বিরূপ প্রভাব এবং ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে মুসলমানদের জীবনে যে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তা থেকে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৬. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রভাব

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত এবং তার পরবর্তীতে হিন্দু ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তীব্র উগ্র 'বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন' মুসলিম সমাজকে সবচেয়ে বেশি চোখ খুলে দেয় এবং নিজেদের অধিকার রক্ষায় পৃথক সংগঠন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৭. ঐতিহাসিক শিমলা ডেপুটেশন

১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ জন মুসলিম নেতার একটি প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে পৃথক দাবিনামা পেশ করেন। এই সফরের সময়ই তারা পৃথক দলের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করেন।

৮. মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন (১৯০৬)

১৯০৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সমাপ্তিতেই আনুষ্ঠানিকভাবে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন ও পাস করা হয়।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

১. ব্রিটিশ সরকারের সাথে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের মনে জমে থাকা দীর্ঘদিনের সন্দেহ দূর করে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সরকারি বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকলে তার অবসান ঘটানো।

২. অধিকার ও স্বার্থরক্ষা

মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন, তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষার আইনি ব্যবস্থা করা এবং অবহেলিত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠা তীব্র ক্ষোভের অবসান ঘটানো।

৩. অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মিত্রতা

অন্যান্য সম্প্রদায়ের (বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের) সাথে মুসলমানদের পারস্পরিক বিদ্বেষভাব দূর করে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করা।

৪. দাবি উপস্থাপন ও কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব

মুসলমানদের ন্যায্য দাবিদাওয়া সংক্রান্ত সুচিন্তিত অভিমত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের নিকট তুলে ধরা এবং সর্বভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের একক প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব করা।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য: আত্মজাগরণ ও রাজনৈতিক একক শক্তি

মুসলমান সমাজে অভূতপূর্ব আত্মজাগরণ

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা তাদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে এবং সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম করে।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ

আগে যেখানে মুসলমানরা রাজনীতিতে অনীহা বা বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল, সেখানে মুসলিম লীগ তাদের সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটি সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়। কংগ্রেসসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে সমঝোতা ও বিরোধের মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক দক্ষতা ও নতুন নেতৃত্ব বিকাশে সক্ষম হয়।

স্বতন্ত্র দাবিদাওয়ার শক্তিশালী উপস্থাপনা

দল গঠনের পর মুসলমানদের দাবি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন শুরু হয়। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি সরকারের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের নানামুখী রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলায় মুসলিম লীগ সরকারকে নিয়মিত সতর্ক করতে শুরু করে।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও বিভাজন বৃদ্ধি

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য আরও তীব্র হয়ে ওঠে। হিন্দু নেতারা দলটির প্রতি তীব্র নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন এবং এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনা করেন, যা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য: পৃথক নির্বাচন ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা (১৯০৯)

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়া ছিল মুসলিম লীগের সবচেয়ে বড় প্রাথমিক রাজনৈতিক সাফল্য। স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে মুসলিমরা শাসন ক্ষমতায় নতুন মাত্রা লাভ করে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা

মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হয়, যা হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বকে এক চূড়ান্ত রূপ দেয়।

প্রাদেশিক শাখাগুলোর সম্প্রসারণ

মুসলিম লীগ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সক্রিয় শাখা গড়ে তুলে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি শক্তিশালী মাঠপর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত করে। স্থানীয় সমস্যা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর রাজনৈতিক সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়।

ঐতিহ্য ও স্বার্থ সংরক্ষণ

প্রারম্ভে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব অভিজাত নবাব ও নাইটদের মধ্য থেকে গড়ে উঠলেও দলের আদর্শগত মূল ভিত্তি ছিল ঐতিহাসিক মুসলিম শক্তি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষা করা। এটি মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় সুরক্ষায় কাজ করে।

নেতৃত্ব ও দক্ষতা বিকাশ

দলীয় কাঠামোর মাধ্যমে তরুণ মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব তৈরি হয়। ব্রিটিশ শাসনের ও কংগ্রেসের সাথে নিয়মতান্ত্রিক দরকষাকষিতে অংশ নিয়ে মুসলমানরা রাজনীতিতে তাদের অবস্থান সুসংহত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭)

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাবই ছিল মুসলিম লীগের দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের ভাগাভাগি এবং স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক পটভূমি

ঐতিহাসিক সূচনা

১৯২৬ সালের **১৯ জানুয়ারি** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে এই সভার মাধ্যমে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ**।

নতুন চেতনার উন্মেষ

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুবাদে ঢাকায় একটি মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন **বিদ্বৎসমাজ** গড়ে ওঠে। এটি তৎকালীন উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে একটি যৌক্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্যবৃন্দ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সাহিত্য সমাজের প্রথম সভাপতি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দীর্ঘকালের অভিভাবক ও এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মূল পৃষ্ঠপোষক।

কাজী আবদুল ওদুদ

আন্দোলনের প্রধান লেখক ও চিন্তাবিদ। তাঁর যুক্তিবাদী প্রবন্ধ ও প্রগতিশীল লেখনী মুসলিম যুবসমাজকে উজ্জীবিত করেছিল।

কাজী মোতাহার হোসেন

বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী ও মানবতাবাদী। তিনি চিন্তা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সেতুবন্ধ রচনায় অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন।

সাহিত্য সমাজের প্রধান কার্যক্রম

সৃজনশীলতা ও প্রকাশনা চর্চা

নিয়মিত সাহিত্য সভা ও আলোচনা: সমাজ নিয়মিত সাহিত্য সভার আয়োজন করত যেখানে সমকালীন সামাজিক সমস্যা, নতুন সাহিত্যকর্ম ও মানবতাবাদ নিয়ে মননশীল আলোচনা হতো।

প্রকাশনা কার্যক্রম: সাহিত্য সমাজ বিভিন্ন প্রগতিশীল বই, পত্রিকা ও সংকলন প্রকাশ করত যা বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে সাহিত্যিকদের চিন্তাভাবনা পৌঁছে দিত।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার: নতুন লেখক ও তরুণ প্রতিভাদের উৎসাহিত করতে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং পুরস্কার প্রদানের ধারা চালু ছিল।

অনুবাদ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ: বিশ্ব সাহিত্যের ধ্রুপদী কর্মসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে পাঠকদের বৈশ্বিক চিন্তার সাথে সংযুক্ত করা হতো এবং প্রাচীন সাহিত্যের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হতো।

নারী জাগরণ ও অধিকার: তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নারীদের সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিত করা হতো।

শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ: মুসলিম তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধে দীক্ষিত করার প্রয়াস চালানো হতো।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

আন্দোলনের মূল দর্শন

কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ছিল **'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'**। বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

'শিখা' পত্রিকা ও স্লোগান

মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ পায় কালজয়ী পত্রিকা **'শিখা'**। এর স্লোগানটি ছিল তৎকালীন সমস্ত বন্ধন ভাঙার প্রেরণা:

"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"

আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা:** সমাজ পরিচালনায় অন্ধ ধর্মীয় রীতিনীতির বদলে যুক্তি ও বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরের ব্যবহার।
- **অসাম্প্রদায়িকতা:** অসাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকে হিন্দু-মুসলিম সকল সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সাধারণ মঞ্চে মিলন।
- **ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতা:** সমাজে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন।
- **ইহজাগতিক চিন্তা:** মানুষের পার্থিব জীবনের স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও মানবিক বিকাশকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন।

বুদ্ধির মুক্তির দিশারী

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪ - ১৯৭০)

ফরিদপুরে জন্ম নেওয়া এই কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক ছিলেন আন্দোলনের মূল স্তম্ভ। তিনি বিশ্বাস করতেন,
"মনের মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক মুক্তি অর্থহীন।"

তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ **'শাশ্বত বঙ্গ'** এবং **'বাংলার জাগরণ'** উনিশ শতকের রেনেসাঁস থেকে শুরু করে ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন পর্যন্ত বাঙালি চেতনার বিবর্তনের এক অপূর্ব তাত্ত্বিক দলিল।

আবুল হোসেন ও কাজী মোতাহার হোসেন

আবুল হোসেন (১৮৯৬ - ১৯৩৮)

তিনি ছিলেন **শিখা** পত্রিকার প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁর প্রবন্ধ ও লেখনীতে রক্ষণশীল সমাজের কড়া সমালোচনা ফুটে ওঠে। তাঁর বিখ্যাত রচনা **আদেশের নিগ্রহ** প্রকাশের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও তিনি তাঁর আদর্শে অবিচল ছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭ - ১৯৮১)

গণিতবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলনে গভীরতা এনেছিল। তিনি বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়; কিন্তু রাষ্ট্র ও শিক্ষার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বজনীন মানবিক কল্যাণ।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

সীমিত গণ্ডি

আন্দোলন মূলত শহরভিত্তিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ জনগণ বা সাধারণ মানুষ এ আন্দোলনের সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত হতে পারেনি।

রাজনৈতিক ধারার অভাব

এই আন্দোলন মূলত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন বা রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ কম ছিল।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা

সমাজের রক্ষণশীল অংশ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রগতিশীল ধারণা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা

আন্দোলনের নেতারা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি থেকে আসলেও তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি দুর্বল ছিল, যার কারণে আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সংগঠিত নেতৃত্বের অভাব

আন্দোলনটি কোনো সংগঠিত দল বা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো পায়নি। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে একে দেশজুড়ে শক্তিশালী করে টিকিয়ে রাখা যায়নি।

ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রতিরোধ

আন্দোলনের যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির আদর্শকে তৎকালীন ধর্মীয় রক্ষণশীল মহল ধর্মবিরোধী হিসেবে দেখত, ফলে তীব্র সামাজিক প্রতিরোধ তৈরি হয়।

আন্দোলনের প্রভাব ও নবজাগরণ

- **সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নতুন ধারা সৃষ্টি**- কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ভেঙে বাঙালি মুসলিম লেখকরা তাদের রচনায় বাস্তব জীবনচিত্র, যুক্তি এবং প্রগতিশীল ভাবধারার বিকাশ ঘটান।
- **সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার অবসান**- হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা দূর করে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো হয়।
- **রাজনীতিতে যুক্তিবাদী নেতৃত্ব**- তরুণ সমাজ মুক্তচিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী ও যুক্তিনির্ভর নেতৃত্ব গড়ে তোলেন, যা রাজনৈতিক চিন্তার সংস্কার ঘটায়।
- **ভবিষ্যৎ জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি**- এই বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করে।
- **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক প্রভাব**- সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষা, নারীশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **সমাজসংস্কারের সামগ্রিক ধারা**- সমাজে বিরাজমান অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সার্বিক পশ্চাৎপদতা দূর করার প্রচেষ্টা জোরদার হয় এবং মুসলিম সমাজে প্রগতিশীল চিন্তার জন্ম হয়।
- **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা**- মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে সমাজে একটি বিজ্ঞানমনস্ক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
- **প্রগতির দীর্ঘস্থায়ী আদর্শ**- ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সক্রিয় থেকে শিখা পত্রিকার মাধ্যমে এটি সমাজ সংস্কারের যে আলো ছড়ায়, তা আজও প্রগতিশীলতার অনন্য ভিত্তি।

ধর্মভিত্তিক পরিচয় ও প্রেক্ষাপট

ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের স্বরূপ

এটি ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের এমন পরিচয়, যা মূলত ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং ব্যক্তির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব ফেলে। এটি কেবল আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, উৎসব, ভাষা ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সামাজিক সম্পর্ক ও সংগঠনকে প্রভাবিত করে।

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট ও উত্থান

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ধর্মীয় পরিচয় রাজনৈতিক সত্তার প্রধান নির্ণায়ক ছিল না। তবে উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রশাসন ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাস ধারণ করে 'Divide and Rule' কৌশল নেয়। ১৮৭২ সালের প্রথম জনগণনা মানুষকে সংখ্যাগত ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে সচেতন করে তোলে, যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিযোগিতার হাতিয়ারে পরিণত হয়।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও রাজনৈতিক মেরুকরণ

বিভাজন নীতি ও প্রতিক্রিয়া

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন প্রশাসনিক দক্ষতার অজুহাতে বঙ্গ প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের Divide and Rule নীতি বাস্তবায়ন।

পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রশাসনিক সুবিধা উপলব্ধি করে ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার গড়ে তোলে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ একে হুমকি মনে করে স্বদেশি আন্দোলন শুরু করে।

এরই ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ধর্মীয় রাজনীতির নতুন যুগের সূচনা করে।

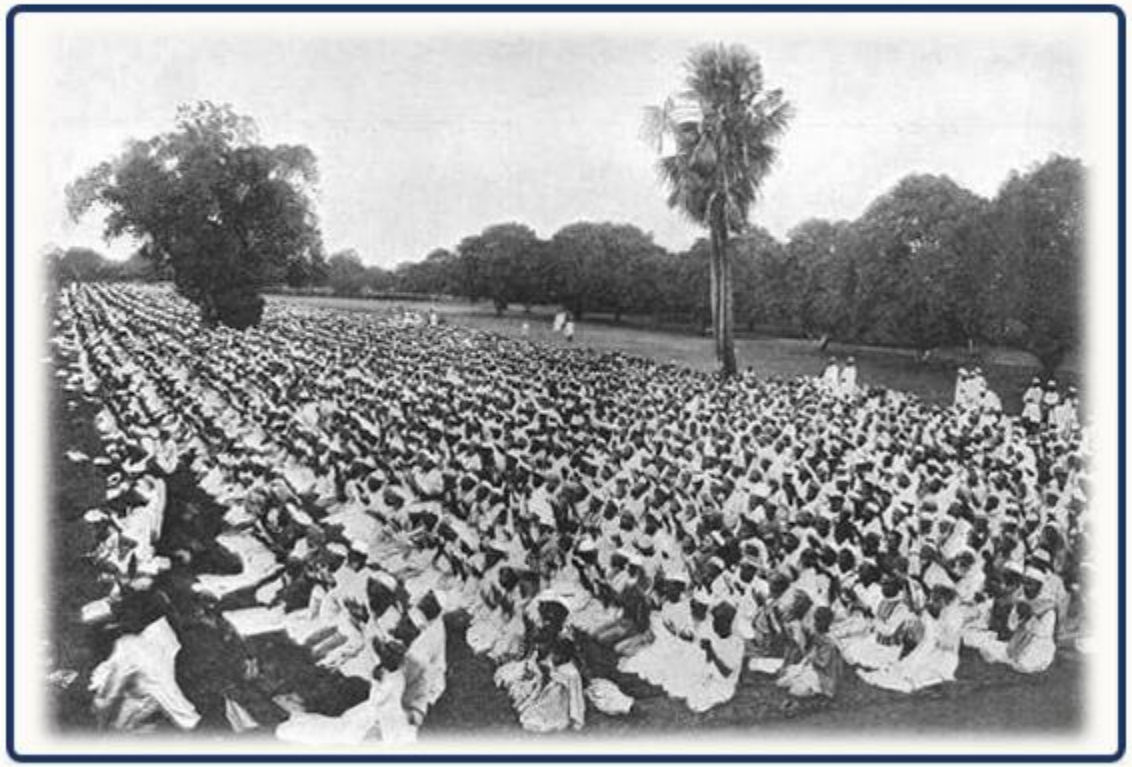

আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম পুনর্জাগরণ

স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদ

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) মুসলিম সমাজকে সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখান। ১৮৭৫ সালে তিনি আলিগড়ে মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা আধুনিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

তিনি মুসলিমদের একটি 'স্বতন্ত্র জাতি' (distinct community) হিসেবে সচেতন করেন, যার স্বার্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের থেকে পৃথক। স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষায় তিনি ছাত্রদের কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক কৌশলের দিকে ধাবিত করেন।

আন্দোলনের মখপাত্র তহযিব-উল-আখলাক মুসলিম সমাজে শিক্ষার রূপান্তর এবং সামাজিক সচেতনতার বার্তা প্রচার করে পাকিস্তান আন্দোলনের বৌদ্ধিক মেরুদণ্ড স্থাপন করে।

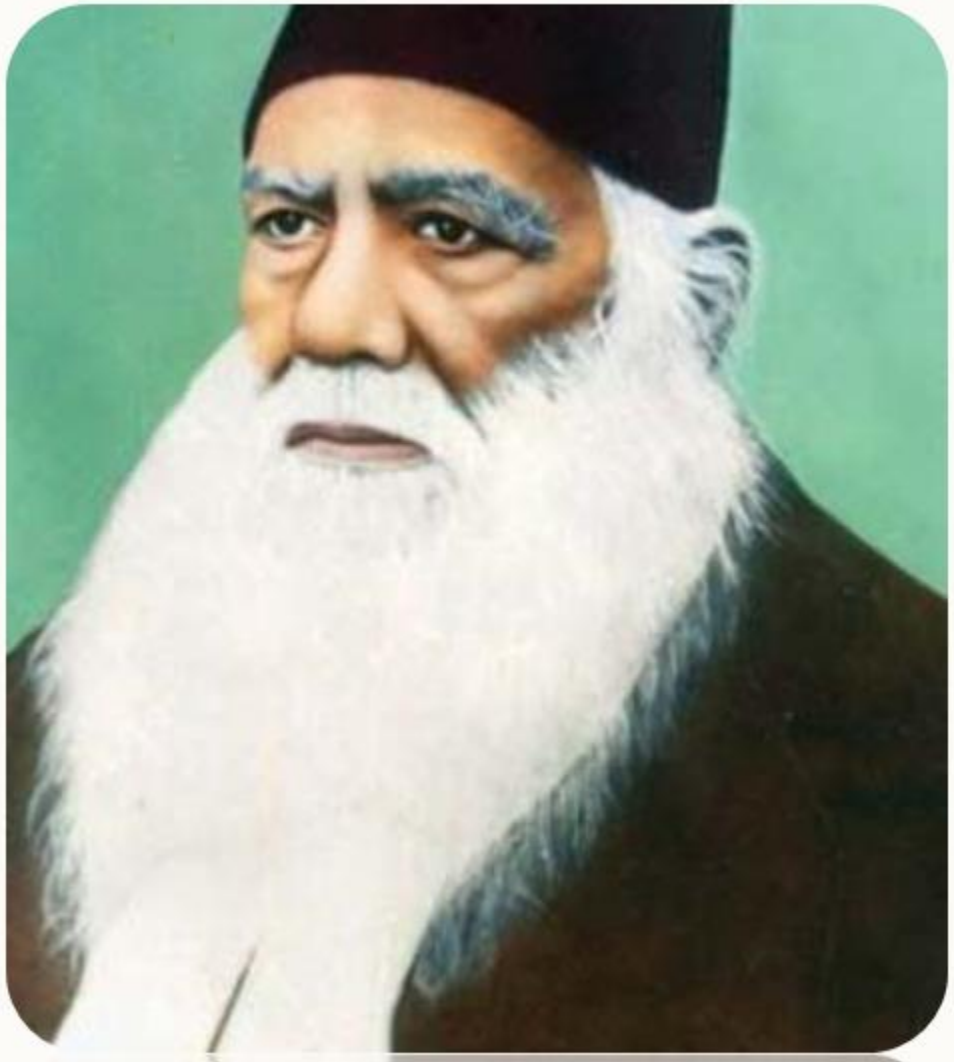

সংস্কার ও পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থা

পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থা (১৯০৯)

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থা চালু করা হয়, যেখানে মুসলিম ভোটাররা কেবল মুসলিম প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারত। এর ফলে নির্বাচনি রাজনীতি সরাসরি ধর্মীয় বিভাজনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। কংগ্রেস ও গান্ধীজি এর তীব্র সমালোচনা করলেও মুসলিম লীগ এটিকে অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম বড় বিজয় হিসেবে দেখে।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড ও দ্বৈত শাসন (১৯১৯)

১৯১৯ সালের সংস্কারের মাধ্যমে প্রদেশে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হলেও পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থা বজায় রাখা হয় এবং তা শিখ, খ্রিস্টানদের জন্যও প্রসারিত হয়। নতুন মুসলিম নেতৃত্বের উত্থান ঘটে, যারা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় জায়গা পান। এর ফলে ধর্মীয় পরিচয় সরাসরি ক্ষমতার পরিমাপক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খিলাফত আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা

ধর্মীয় আবেগের রাজনৈতিক রূপান্তর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী এবং আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়।

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একে যুক্ত করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এই আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে।

তবে ১৯২২ সালে চৌরি-চৌরার ঘটনার পর গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে এই সহযোগিতা ভেঙে যায়, যা পরবর্তীতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়।

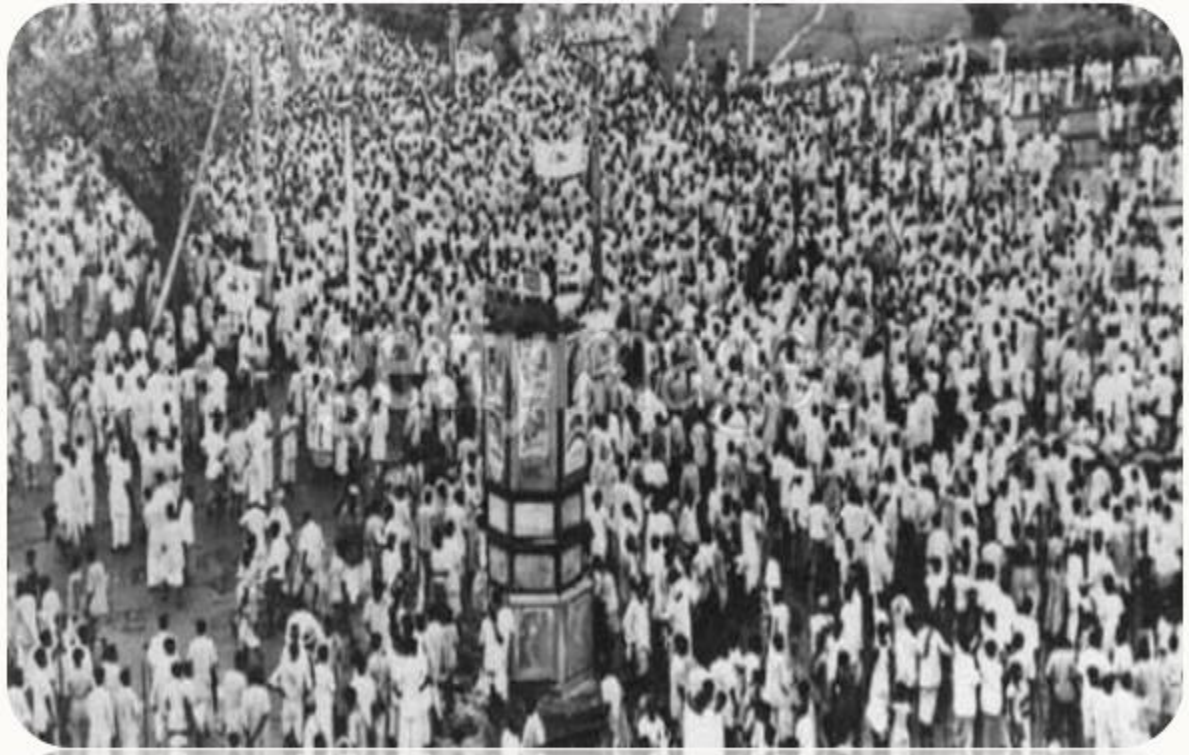

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান

হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস (RSS)

১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয় যা ধীরে ধীরে সামাজিক থেকে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯২৩ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকর 'Hindutva: Who is a Hindu?' গ্রন্থে হিন্দু পরিচয়কে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রূপ দেন। ১৯২৫ সালে আরএসএস (RSS) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সাংগঠনিক প্রসার ঘটে, যা সেকুলার জাতীয়তাবাদের পথকে জটিল করে তোলে।

১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ধর্মীয় বিভাজনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। এতে মুসলিম, শিখ ও দলিতদের পৃথক আসন দেওয়া হয়। দলিতদের পৃথক নির্বাচনি এলাকার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করলে পরবর্তীতে পুনা চুক্তি (Poona Pact) স্বাক্ষরিত হয় এবং দলিতরা হিন্দুদের সাধারণ আসনেই সংরক্ষিত সুযোগ পায়।

দেশভাগের পথে যাত্রা (১৯৩৭-১৯৪৭)

সময়কাল	ঐতিহাসিক ঘটনা	ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রভাব
১৯৩৭	প্রাদেশিক নির্বাচন ও কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠন	মুসলিম লীগ দুর্বল ফলাফল করায় মুসলিম নেতৃত্ব নিজেদের বঞ্চিত মনে করতে শুরু করে এবং মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার তাগিদ অনুভব করে।
১৯৪০	ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ	দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two-Nation Theory) ওপর ভিত্তি করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য পৃথক ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করা হয়।
১৯৪৫-৪৬	সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান	মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত প্রায় ৯০% আসনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে এবং নিজেদের মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রমাণ করে।
১৯৪৭	ভারত বিভাজন ও স্বাধীনতা অর্জন	ধর্মীয় রাজনৈতিক পরিচয়ের চূড়ান্ত বিজয় ঘটে এবং ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের হাত ধরে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিচয় রাজনীতির বহুমাত্রিক প্রভাব

- **রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ-** ধর্মীয় পরিচয় ব্যক্তিগত গণ্ডি থেকে বের হয়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতির কেন্দ্রীয় কাঠামোর সবচেয়ে প্রভাবশালী চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।
- **সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক বিভাজন-** তিলকের গণপতি উৎসব বা খিলাফতের মতো কার্যক্রম সাংস্কৃতিক প্রতীককে রাজনৈতিক বার্তায় রূপ দেয়, যা হিন্দু-মুসলিমদের সামাজিক দূরত্বকে তীব্র করে।
- **জাতীয়তাবাদের চিরস্থায়ী বিভাজন-** কংগ্রেসের সেকুলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মতো সংগঠনের প্রভাবে জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।
- **সংখ্যালঘু স্ব-সচেতনতা বৃদ্ধি-** কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের ফলে মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ও দলিতরা স্ব স্ব ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয়ে সংগঠিত হয় এবং রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উদ্ভব ও বিকাশ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সূচনা

১. **সনাতন ধর্মের ঐতিহাসিক বিশ্বাস:** আদি ও প্রাচীন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করতেন এ মাটি ও দেশ শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের। এ চেতনা থেকেই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মানসিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

২. **উচ্চবর্ণের কলকাতার প্রভাব:** মধ্যযুগে কলকাতায় মুসলমানদের আগমন ও বসবাস উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। কলকাতাকে নিজেদের কর্তৃত্বে রাখতে তারা হিন্দুত্ববাদী চেতনার রাজনৈতিক ব্যবহার শুরু করে।

৩. **বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যের ভূমিকা:** রাজা রামমোহন রায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হিন্দুত্ববাদ প্রখর করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী চেতনার ছবি স্পষ্ট রূপ পায়।

সাংগঠনিক বিকাশ ও চরম রূপ

৪. **সভা, সমিতি ও মেলার ভূমিকা:** রাজ নারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা' গোঁড়া সনাতন অনুসারীদের একত্রিত করে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি উসকে দেয়।

৫. **১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন:** বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুরা পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিলে চরম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও রাজনৈতিক বিরোধের সূত্রপাত ঘটে।

৬. **অসহযোগ ও লাহোর প্রস্তাব পরবর্তী পর্যায়:** বঙ্গভঙ্গ রদ, খিলাফত ও অসহযোগ ব্যর্থ হলে হিন্দু নেতারা স্বদেশির আড়ালে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে, যা ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ৪টি মূল যুক্তি

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর জওহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেন, " ভারতে দুটি শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান- একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস।" এর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ১৯৩৯ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

- **উপমহাদেশের বাস্তবতা:** ভারত একক কোনো দেশ নয়, বরং এটি একটি বিশাল উপমহাদেশ। অঞ্চল ও জাতিভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র গঠন এখানে অত্যন্ত যৌক্তিক।
- **স্বতন্ত্র জাতির সমতা:** যে ভিত্তিতে এ মহাদেশে হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, ঠিক সেই একই ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভিত্তিতে মুসলমানরাও একটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি।
- **ভিন্ন জীবনধারা ও সংস্কৃতি:** মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা, অনন্য সাহিত্য, শিল্পকলা, নৈতিক বিধান, আচার-ব্যবহার, দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
- **ভিন্ন ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণা:** হিন্দু ও মুসলিম সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও নায়ক থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাই আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞায় মুসলমানরা পৃথক আবাসভূমির দাবিদার।

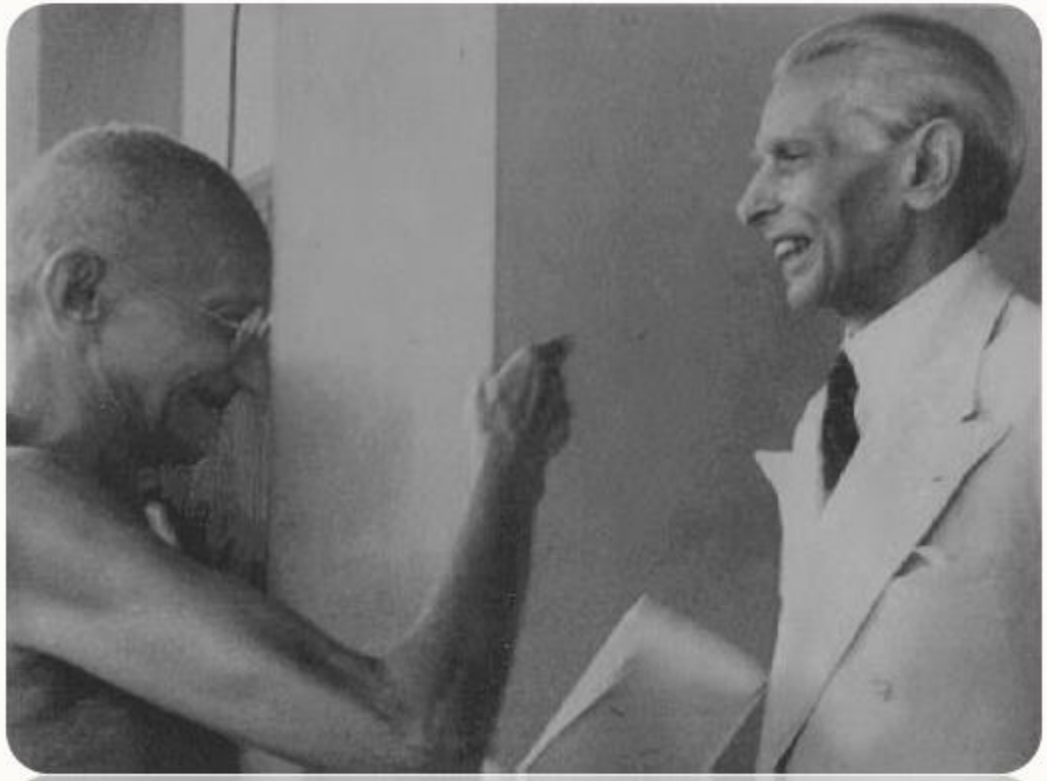

মুসলিম সমাজে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব ও সুফল

মুসলিম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি

দ্বিজাতিতত্ত্ব মুসলমানদের মনে এক স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বিশ্বব্যাপী চলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়, যা পরে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

সাম্প্রদায়িক সামাজিক ঐক্য

এই তত্ত্ব প্রচারের ফলে বিচ্ছিন্ন থাকা মুসলিম সম্প্রদায় উপলব্ধি করে যে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটি তৎকালীন বিভক্ত মুসলিম নেতাদের এক অভিন্ন পতাকাতলে নিয়ে আসে।

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও মুক্তির স্বপ্ন

তৎকালীন বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং রাজনৈতিক অধীনতা থেকে স্থায়ী মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে ভারতের মুসলমানরা নিজেদের জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

হিন্দু আধিপত্য থেকে রক্ষা

ইংরেজ আমলের শুরু থেকেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে এবং হিন্দুরা শিক্ষা-চাকরিতে এগিয়ে গিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করে। জিন্নাহর তত্ত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের এই স্থায়ী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের ভীতি থেকে মুসলমানদের রক্ষা করে।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণ

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা প্রথমবার মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকে সামনে রেখে নিজেদের ঐতিহ্য পুনর্গঠনে এবং দুর্ভাগ্য দূরীকরণে তারা নব উদ্দীপনায় জেগে ওঠে।

হীনম্মন্যতা ও দাঙ্গা থেকে মুক্তি

অখণ্ড ভারতে মুসলমানরা চিরকাল 'সংখ্যালঘু' পরিচয়ের হীনম্মন্যতায় ভুগত। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা ফিরে পায় এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাতময় দাঙ্গা থেকে স্থায়ী মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ও তত্ত্বগত সংজ্ঞা

সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

১. **সাধারণ ধারণা:** ধর্মের নামে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা ধর্মকে অন্ধতায় রূপান্তর করে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ বিস্তারে একে ব্যবহার করে এবং অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মূল্যবোধকে দ্বন্দ্বপূর্ণ মনে করে।

২. **বদরুদ্দীন উমরের মতে:** "কোনো ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্ম সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে।"

৩. **পণ্ডিত আবু সাইয়্যিদের মতে:** "সাম্প্রদায়িকতা হলো ধর্মের চেয়ে ধর্ম সম্প্রদায়কে এবং ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীকে বড় করে দেখা। একজন সাম্প্রদায়িক মানুষ অন্যের চরিত্র, বিদ্যা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের খোঁজ না নিয়ে প্রথমেই জানতে চায় সে ব্রাহ্মণ না শূদ্র, হিন্দু না মুসলমান।"

ঐতিহাসিক রূপান্তর ও বিস্তার

- **ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থা:** নতুন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু জমিদার-মহাজন এবং মুসলিম কৃষক প্রজার সৃষ্টি হয়, যা শ্রেণিগত শোষণকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ দেয়।
- **ব্রিটিশ 'Divide & Rule' নীতি:** ব্রিটিশরা সচেতনভাবে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে বিভাজন তৈরি করে যেন কোনো ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ গড়ে না ওঠে।
- **প্রাত্যহিক সামাজিক দ্বন্দ্ব:** মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যযন্ত্র বাজানো শোভাযাত্রা এবং মুসলমানদের গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে সংঘাত ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের ঐতিহাসিক কারণ ও বিভাজন

ঐতিহাসিক ঘটনা	মূল রাজনৈতিক কারণ ও প্রভাব	সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে ফলাফল
উগ্র হিন্দু মহাসভার ঘোষণা (১৯২৩)	উর্দু ভাষাকে বিজাতীয় ঘোষণা করা হয়। মুসলমানদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা (শুদ্ধি আন্দোলন) দাঙ্গা ও চরম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে।	হিন্দু-মুসলিম আস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।
সংগঠন সৃষ্টি ও বিভক্তি	হিন্দুদের কংগ্রেস, হিন্দুমেলা ও ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিপরীতে মুসলমানদের মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি ও মুসলিম লীগ গড়ে ওঠে।	উভয় সম্প্রদায় সাংগঠনিকভাবে চিরতরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।
নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নাহর ১৪ দফা	১৯২৮ সালের নেহেরু রিপোর্টে মুসলমানদের চাকরিতে আসন সংরক্ষণের দাবি উপেক্ষিত হয়। প্রতিক্রিয়ায় ১৯২৯ সালে জিন্নাহ তাঁর ১৪ দফা দাবি পেশ করেন।	উদারমনা মুসলিম নেতারা কংগ্রেসের ওপর সম্পূর্ণ ক্ষুব্ধ হন।
মন্ত্রিসভা গঠন দ্বন্দ্ব (১৯৩৭-১৯৪৬)	নির্বাচন পরবর্তী প্রাদেশিক সরকারগুলোতে মুসলিম লীগকে পাশ কাটিয়ে কংগ্রেস অসহযোগিতামূলক ও একতরফা ভূমিকা পালন করে।	মুসলমানদের মনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধীনে আজীবন বঞ্চিত থাকার ভীতি জন্মায়।
১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ দাঙ্গা	১৬ আগস্ট কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের রক্তক্ষয়ী প্রাণহানি ঘটে, যা দুই সম্প্রদায়ের একসাথে বসবাসের পথ রুদ্ধ করে।	১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্মকে অনিবার্য করে তোলে।

সাম্প্রদায়িক চিন্তার উন্মেষে হিন্দু ও মুসলিমদের ভূমিকা

হিন্দুদের ভূমিকা

- ভাষা পরিবর্তনের উদ্যোগ (১৮৬৭): বারানসির হিন্দু নেতৃবৃন্দ উর্দুর পরিবর্তে 'ব্রিজ' এবং আরবির বদলে 'দেবনগরী' হরফ গ্রহণের আন্দোলন শুরু করলে মুসলিমদের নিরাপত্তা শঙ্কা বৃদ্ধি পায়।
- হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭): নব গোপাল মিত্র 'ভারতমেলার' বদলে 'হিন্দুমেলা' নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা সাম্প্রদায়িক চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন ছিল।
- জাতীয়তাবাদ ও সাহিত্যিক প্রভাব: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনসেন লেখায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলেন এবং ব্রিটিশ শাসনকে 'উত্তম' আখ্যা দেন।
- অসহযোগ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মুসলমানদের প্রবেশাধিকারহীন 'হিন্দু কলেজ' স্থাপন হিন্দুদের এগিয়ে নেয়। উপরন্তু, আলেম-উলামাদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে হিন্দুরা অসহযোগিতা করে।

মুসলমানদের ভূমিকা

- ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার: নবাব আব্দুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৩৬) ও স্যার সৈয়দ আহমদের 'আলীগড় কলেজ' (১৮৭৫) মুসলমানদের শিক্ষার পথ সুগম করে।
- প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান: সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৭ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত করতে।
- মিডিয়া ও সমিতি গঠন: ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে মুসলিম পত্রপত্রিকায় মুসলিম কৃষ্টির প্রাধান্য লাভ করে এবং ঢাকায় 'মুসলিম সুহৃদ সমিতি' (১৮৮৩) ঐতিহ্য পুনরোদ্ধারে ব্রতী হয়।
- কংগ্রেসের বিকল্প সৃষ্টি: কংগ্রেসকে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন মনে করে মুসলমানদের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ১৯০৬ সালে ঐতিহাসিক 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৪৬ সালের কলকাতার রক্তাক্ত দাঙ্গা: কারণসমূহ

প্রত্যক্ষ কারণসমূহ

- **মন্ত্রিমিশনের ব্যর্থতা (১৯৪৬):** ভারতকে ৩টি গ্রুপে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মেনে নিলেও আবুল কালাম আজাদের জায়গায় নেহেরু সভাপতি হওয়ার পর জটিলতা বাড়ে।
- **জিন্নাহর অনড় অবস্থান:** কোয়ালিশন সরকার গঠনে অস্বীকৃতি জানিয়ে জিন্নাহ ঘোষণা করেন—*"Muslims are not a minority... Muslims are a nation"* এবং পাকিস্তানে অনড় থাকেন।
- **প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস:** লর্ড ওয়াভেল নেহেরুকে সরকার গঠনের নির্দেশ দিলে মুসলিম লীগ এর প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে।
- **সোহরাওয়ার্দীর কলকাতা সম্মেলন:** ব্রিটিশদের বিশ্বাসভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতার বিশাল প্রতিবাদ সভা দাঙ্গার সূচনা ঘটায়।

পরোক্ষ কারণসমূহ

- **ঐতিহাসিক ক্ষোভ ও বঞ্চনা:** দ্বিজাতিতত্ত্বের তীব্র বিকাশ এবং ব্রিটিশদের অধীনে দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে মুসলমানদের পুঞ্জীভূত নিষ্পেষণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
- **রাজনৈতিক নেতাদের উসকানি:** হিন্দু মহাসভার মতো উগ্রপন্থী নেতাদের উসকানিমূলক মন্তব্য মুসলমানদের অন্তরে গভীর আঘাত হানে।
- **মিডিয়ার দলীয় পক্ষপাতিত্ব:** সমসাময়িক দলীয় পত্রপত্রিকায় উগ্রবাদী ও উসকানিমূলক মিথ্যাচারের মাধ্যমে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানদের একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক করে তোলা হয়।

কলকাতা দাঙ্গার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল

১. মানবিক বিপর্যয় ও স্থানান্তর: ৩ দিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর জীবন বাঁচাতে অসংখ্য মানুষ নিজেদের ভিটামাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। হিন্দুরা হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকায় এবং মুসলমানরা মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। যুগ যুগ ধরে চলা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমূলে বিনষ্ট হয়।

২. রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পতন: দাঙ্গায় মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কংগ্রেসের তীব্র চাপে মুসলিম লীগ সমর্থিত সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

৩. উগ্রপন্থার উত্থান ও মুসলিম ঐক্য: দাঙ্গার পর একদিকে উগ্রপন্থী হিন্দুরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মুসলমানরা 'একলা চলোরে' নীতি পরিহার করে বৃহত্তর ঐক্য গড়তে মুসলিম লীগকে সর্বাত্মক সমর্থন দেয়, যা ১৯৪৭-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপুল বিজয়ের পথ উন্মোচন করে।

৪. দেশভাগের অনিবার্যতা: এই দাঙ্গা প্রমাণ করে যে একই রাজনৈতিক পরিবেশে দুই সম্প্রদায়ের সহাবস্থান অসম্ভব। ব্রিটিশদের সামনে দেশভাগ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি

৪,০০০+
নিহত (সরকারি জরিপে)

১,০০,০০০+
মানুষ আহত

৩ দিন
১৬-১৯ আগস্ট কলকাতা অচল

১৯৪৭ সালের ৩ জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও প্রাদেশিক বিভাজন

পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই অংশে ভাগ করে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হবে।
- বাংলা ও পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম ও অমুসলিম অংশের সদস্যরা আলাদা সভায় বসে বিভক্তির সিদ্ধান্ত নেবেন। যেকোনো এক অংশ বিভক্তির পক্ষে প্রস্তাব দিলে প্রদেশ ভাগ করা হবে।
- সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের ভাগ্য গণপরিষদের ওপর এবং সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেটের ভাগ্য গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

"ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন এই চূড়ান্ত দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা পেশ করেন।"

বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রস্তাবিত প্রতিনিধিত্ব আসন কাঠামো:

এলাকা	হিন্দু আসন	মুসলিম আসন	শিখ আসন	মোট আসন
পশ্চিম বাংলা	১৫	৪	-	১৯
পূর্ববাংলা	১২	২৯	-	৪১
সিলেট	১	২	-	৩
পশ্চিম পাঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব পাঞ্জাব	৬	৪	২	১২

ভারত বিভক্তির পটভূমি: ঐতিহাসিক যাত্রা

১৮৫৭-১৯০৬

সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ দমননীতি এবং অধিকার আদায়ে মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ (১৯০৬)।

১৯২৮-১৯২৯

নেহেরু রিপোর্টের মুসলিম স্বার্থবিরোধী নীতির জবাবে জিন্নাহর বিখ্যাত ১৪ দফা ঘোষণা।

১৯৪০-১৯৪২

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাস এবং ক্রিপস মিশনের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব বর্জন।

১৯৪৬-১৯৪৭

সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভূমিধস বিজয় এবং অবধারিত পাকিস্তান সৃষ্টির চূড়ান্ত পথ নির্মাণ।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মূল ধারা

দুই স্বাধীন ডোমিনিয়ন

ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করা হয়।

গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব

উভয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদকে স্ব স্ব সংবিধান প্রণয়ন ও যেকোনো আইন পরিবর্তনের অসীম ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

ব্রিটিশ রাজকীয় কর্তৃত্বের অবসান

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করে কমনওয়েলথ ছাড়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান

নতুন সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাজনের জটিল সমীকরণ

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলায় ঐতিহাসিক ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়:

- **মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব:** ১০৬:৩৫ ভোটে অখণ্ড বাংলার প্রতি এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের গণপরিষদে যোগ দেওয়ার সমর্থন জানায়।
- **হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব:** বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে ৫৮:২১ ভোটে বাংলা বিভক্তি ও ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে রায় দেয়।
- **নেতৃত্বের ব্যর্থতা:** সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর "অখণ্ড স্বাধীন বাংলা"র উদ্যোগ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়।

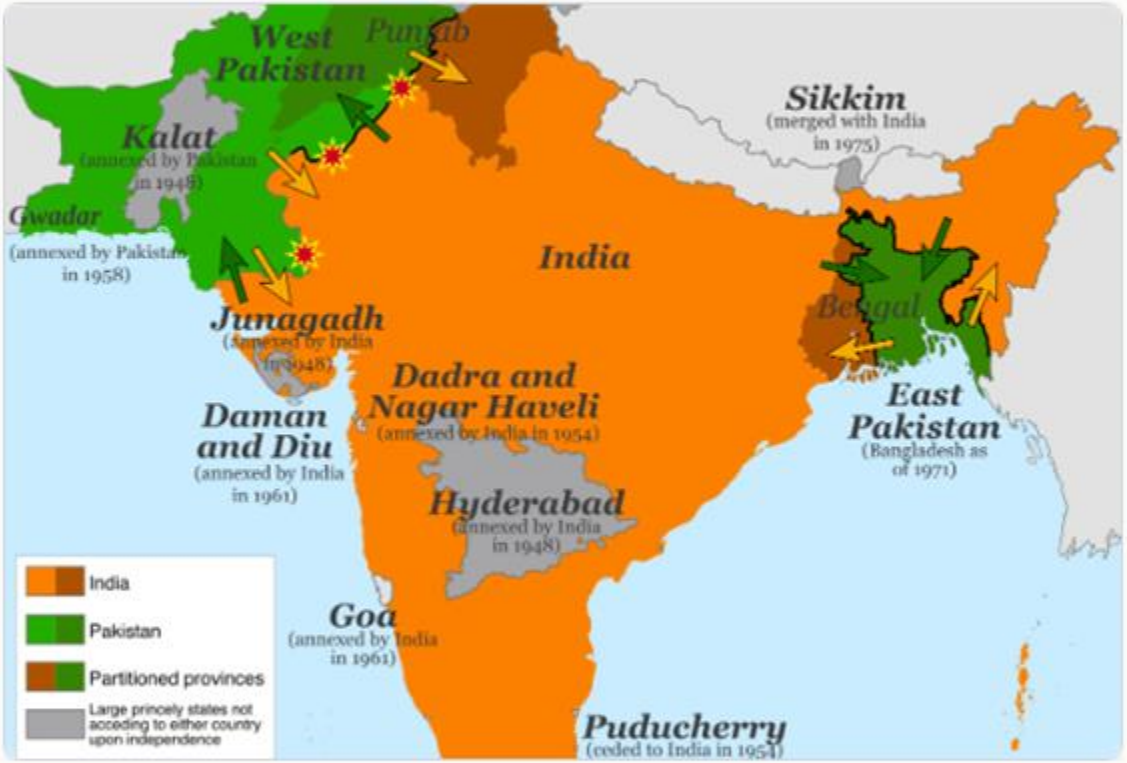

পাকিস্তান সৃষ্টি (১৯৪৭): ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈষম্য

নামকরণ ও ভৌগোলিক বিন্যাস

১৯৩৪ সালে চৌধুরী রহমত আলী তার 'Now or Never' গ্রন্থে "PAKISTAN" নামটির প্রস্তাব করেন। যেখানে প্রতিটি অক্ষর দ্বারা অঞ্চল নির্দেশিত হয়:

P = Punjab | A = Afghania | K = Kashmir | S = Sindh | TAN = Baluchistan

কিন্তু ভৌগোলিকভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া ৫৬.৩% বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার সাথে নাম ও সংস্কৃতির কোনো সংযোগ রাখা হয়নি।

১৫.৭% পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ড (আয়তন)	**৮৪.৩%** পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ড (আয়তন)
৫৬.৩% পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা (বাঙালি)	**৪৩.৭%** পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা

র‍্যাডক্লিফ কমিশন ও বিতর্কিত সীমানা

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ দিল্লির অফিসকক্ষে বসে সরেজমিনে না গিয়ে মাত্র ১ সপ্তাহে ভারতের মানচিত্রের ওপর সীমানা চূড়ান্ত করেন:

- **কলকাতার ক্ষতি:** ২৩.৫৯% মুসলিম জনসংখ্যা থাকায় একমাত্র সমুদ্রবন্দর কলকাতা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **অন্যায্য সীমানা:** মুর্শিদাবাদ (৫৬.৬% মুসলিম) ও নদীয়া (৬১% মুসলিম) হওয়া সত্ত্বেও বড় অংশ ভারতকে দেওয়া হয়।
- **ক্ষতিপূরণ ও সিলেট:** নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ হারানোর ক্ষতিপূরণস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব বাংলাকে এবং সিলেটের বড় অংশ রেফারেন্ডামের মাধ্যমে যুক্ত হয়।

পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ ও পূর্ব বাংলার শোষণ

অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ

দেশভাগের সাথে সাথেই ১ হাজার ২ শত মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের দেয়াল গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের কাঁচামালের যোগানদার ও পণ্যের কৃত্রিম বাজারে পরিণত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতেই গণপরিষদ সদস্য বেগম শারেস্তা ইকরামুল্লাহ্ অভিযোগ করেন, পূর্ব বাংলাকে কলোনির মতো ব্যবহার করা হচ্ছে।

সর্বাত্মক শোষণ ও অধিকার হরণ

পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের ইতিহাস ছিল পাঞ্জাবি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর একনায়কত্ব, শোষণ ও শোষণের ইতিহাস। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতি, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শোষণ টিকিয়ে রাখার প্রধান অস্ত্র হিসেবে প্রথমেই আঘাত হানা হয় ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালির ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ও স্বাধিকার আন্দোলন

পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির তীব্র আন্দোলনের ক্রমানুসারী ইতিহাস:

- **১৯৫২: ভাষা আন্দোলন** - প্রথম তীব্র প্রতিরোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার বীজ।
- **১৯৬২: শিক্ষা আন্দোলন** - বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগ্রাম।
- **১৯৬৬: ৬-দফা আন্দোলন** - বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক সনদ।

১৯৬৯-১৯৭১: গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীন বাংলাদেশ - দীর্ঘ যুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জন।